সাপ্তাহিক EUROBANGLA
ইউরোবাংলা

Board of Management
- Chairman
  Meah Monirul Alam
- Vice Chair
  Sheikh Mohd. Tahir Ullah
- Managing Director
  Helal Uddin
- Director
  Nurul Islam Khan
  Islam Uddin

- Editor
  Muzammel Hussen
- Executive Editor
  Kamal Sikder
- Special Correspondent
  Akbar Hussain
- News Editor
  Siratul Ambia
- Staff Reporter
  Badruzzaman Babul
- Manager
  Moudud Ibn Habib

- Media Consultant
  Dr. Mozammel Haque

117 Whitechapel Road London E1 1DT
Tel: 020 7377 0311 Fax: 0207 426 2082
E-mail: info@eurobangla.co.uk
Bangla Khobor Limited. Company Reg. No. 6885764

## সম্পাদকীয়

### বারোই রবিউল আউয়াল রাসূল সাঃ-এর আদর্শের দীক্ষা নিতে হবে

বারোই রবিউল আউয়াল। চান্দ্রবছরের এ দিনটিকে মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাঃ-এর পবিত্র জন্মের শুভ উপলক্ষ হিসেবে মুসলিম উম্মাহ অত্যন্ত আন্তরিকতা ও উৎসাহের সাথে উদযাপন করে থাকে। কেননা মাটির পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার শেষ নবীর আগমন শুধু মুসলিম উম্মাহ নয়, বিশ্বমানবতার জন্য বিশেষ তাৎপর্যবহ। এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আরব মরুর এক জীর্ণকুটিরে মা আমেনার কোল উজালা করে ধূলির ধরায় তাশরিফ আনেন সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামিন। বিশ্বমানবতার ইহ ও পরকালীন জীবনের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের দিশা দেয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে পৃথিবীতে পাঠান। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর এই সময়টি ছিল মানবেতিহাসের সবচেয়ে অধঃপতনের যুগ। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে যাদেরকে এই নশ্বর দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে, সেই মানবজাতি তখন মহান স্রষ্টার প্রতি দাসত্ব ও আনুগত্য প্রদর্শনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ভুলে গিয়েছিল। পাশাপাশি মানুষ ভুলে গিয়েছিল নিজেদের মর্যাদা। অলীক ও অসার উপাস্য আবিষ্কার করে তারা সেগুলোর সামনে বিলীন করে দিত নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা। অনাচার ও পাপাচারের কোনো দিক বাকি ছিল না সেই সমাজে। হজরত ঈসা আঃ-এর প্রতি নাজিল হওয়া আসমানি কিতাব বিকৃত করে ফেলেছিল তার অনুসারী হিসেবে দাবিদার একটি শ্রেণী। প্রকৃত অনুসারীরা লোকালয় ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন নির্জন এলাকায়। সমকালীন দুই পরাশক্তি রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য জনসাধারণকে শোষণেই ব্যস্ত ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মানবতাকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ তায়ালা তার শ্রেষ্ঠ হাবিবকে পাঠান।

শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে তিনি চার পাশের অনাচার ও অসঙ্গতিতে ব্যথিত হয়েছিলেন। এগুলোর প্রতিকারে সচেষ্ট ছিলেন। অনুপম চরিত্রমাধুর্যে সবার কাছে তিনি বরিত হয়েছিলেন বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে। যৌবনে বৈষয়িক কর্মকান্ডের সাথে জড়তি হয়ে তিনি সততা ও নিভুর্রযোগ্যতার সর্বোচ্চ মাপকাঠিতে উন্নীত হন। ৪০ বছর বয়সে তিনি লাভ করলেন নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠতম পদমর্যাদা। আদিষ্ট হলেন বিপথগামী মানবসমাজকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়ার।

মনে হয় সেই অবস্থার পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। সারা বিশ্বের মুসলমানেরা আবার সচেতন হয়ে উঠছেন। স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে জেগে উঠছেন তারা। তিউনিসিয়া, মিসর, লিবিয়া, ইয়েমেনের পথ ধরে সিরিয়ায় হয়তো অচিরেই শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করবে। মরক্কো ও জর্ডানেও ব্যতিক্রম হবে না। এমন পরিস্থিতিতে এবার পালিত হচ্ছে বারোই রবিউল আউয়াল। অতএব আজকের দিনের অঙ্গীকার হতে হবে জীবনের সব ক্ষেত্রে নবুবী আদর্শ পুনরুজ্জীবনের। মুসলমানদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার। আল্লাহ তার প্রিয় নবীর উম্মতকে সেই তাওফিক দান করুন।

# এখন আওয়ামী লীগই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যুক্তি

**আতাউস সামাদ**

হেরে গেল বাংলাদেশ। হারল অন্য কোনো দেশের কাছে নয়, দেশটির এ পরাজয় তার নিজের শাসকদের কাছেই। গতকাল (রোববার) বাংলাদেশের সামনে একটা সুযোগ এসেছিল সভ্য আচরণ ও গণতান্ত্রিক নীতিকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে বিশ্ব দরবারে তার নিজের সম্মান বাড়ানোর। কিন্তু যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন তাঁরা সম্ভবত এভাবে বিষয়টাকে দেখছেন না। ফলে সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার যে আইনি ক্ষমতা সরকারের আছে তার অপব্যবহার করে গতকাল বিএনপি ও তার সমমনা দলগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে সারাদেশে গণমিছিল করতে যাচ্ছিল রাজধানী ঢাকা ও অন্য আরও ছয়টি প্রধান শহরে সেগুলো বন্ধ করে দিল।

সরকার হয়তো বলবে, রাজধানীতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে, কারণ তারা যে হুকুম দিয়েছে তাতে গতকালকে আওয়ামী লীগের যে জনসভা হওয়ার কথা ছিল তাও নিষিদ্ধ করেছে। বস্ড়ুতপক্ষে ডিএমপি যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে তাতেই বলা আছে, '২৯ জানুয়ারি ঢাকা মহানগরীতে বিএনপির (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) গণমিছিলের কর্মসূচি রয়েছে।

এই মিছিলে শরিক জোট ও সমমনা ১৬ দলের নেতাকর্মীরা অংশ নেবেন বলে জানা যায়। অপরদিকে একই দিনে বিকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।' ডিএমপির হুকুম জারিকারক মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বিজ্ঞপ্তিতে এরপর বলছেন যে তাঁর কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে একই দিনে ঢাকা মহানগর এলাকায় গণমিছিল ও সমাবেশের কর্মসূচি 'আহ্বান করায়' অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম ও সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। আর সেরকম অঘটন এড়ানোর জন্যই তিনি ডিএমপি আইনের ২৮ ও ২৯ ধারার ক্ষমতাবলে রোববার সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় সব ধরনের মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ, গণ-অবস্থান, সভা-সমাবেশ, মিছিল, সব ধরনের ছড়ি বা লাঠি, বিস্ফোরক দ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। মূল কথা হলো বিএনপি ও আওয়ামী লীগ একই দিনে যথাক্রমে মিছিল ও জনসভা ডাকায় আইনশৃঙ্খলা বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে বলে কমিশনার সাহেব আশঙ্কা করলেন এবং প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে দুটিই নিষেধ করে দিলেন। এতে সরকারপক্ষ আওয়ামী লীগকেও কোনো খাতির করা হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশে 'কোনো পাগল ও শিশুও' এ নিরাপত্তায় বিশ্বাস করবে না।

প্রথমত, দেশের সবার কাছেই 'আসল সত্য' হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে, ডিএমপি কমিশনার আরও ওপর থেকে নির্দেশিত হয়েছেন বলেই মিছিল, সমাবেশ, সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা এও মনে করেন যে, ডিএমপির ক্ষমতা দিয়ে বিএনপির ঘোষিত গণমিছিল ভন্ডুল করানোর জন্যই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দল ঢাকা শহরে রোববার বিএনপি-বিরোধী জনসভা করার ঘোষণা দিয়েছিল। কেন জনগণ এরকম ভাবেন? তা এজন্য যে, আওয়ামী লীগ ২০০৮-এর নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সারা বাংলাদেশে বিরোধী দলের সভা-সমাবেশ বানচাল করার জন্য একই স্থানে একই দিনে 'পাল্টাপাল্টি' সমাবেশ ডাকার ভণিতা করে আসছে। তারা এরকম হঠাৎ পাল্টা সমাবেশ আহ্বান করলেই স্থানীয় প্রশাসন সেইদিন সেখানে সব ধরনের কর্মসূচি নিষেধ করে দিচ্ছে। মনে হয় যেন ক্ষমতাসীন দল সরকারি প্রশাসনকে বলেই রেখেছে যে, বিরোধী দলের কোনো জনসভা বা সমাবেশ আমরা বন্ধ করতে চাইলেই সেই একই দিনে একই জায়গায় জনসভা ডাকব আর তোমরা ১৪৪ ধারা বা অন্য যুত্সই কোনো আইন (যেমনড়াকায় ডিএমপি অর্ডিন্যান্স) দেখিয়ে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেবে। গতকাল (রোববার, ২৯ জানুয়ারি)

আমার দেশ পত্রিকায় একটি খবর ছাপা হয়েছে যে, গত ২৫ মাসে বাংলাদেশে ২৪৫ স্থানে মিছিল-সমাবেশ বন্ধ করা হয়েছে ১৪৪ ধারার অপব্যবহার করে। এ খবরটিকে আমার মন্তব্যের সপক্ষে উলেখ করলাম। তবে সরকার এর চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে তা স্পষ্ট, কারণ আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে ২০০৯ সালের হিসাব নেই। বিএনপির গতকালের প্রস্ড়াবিত গণমিছিল যে ক্ষমতাসীন দলই নিষিদ্ধ করিয়েছে তার তৃতীয় প্রমাণ হলো বিএনপির মিছিলের কর্মসূচি দলের চেয়ারপার্সন চট্টগ্রামে এক বিশাল সমাবেশে ঘোষণা করেছিলেন গত ৯ জানুয়ারি আর আওয়ামী লীগ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে তাদের জনসভা করার কথা বলেছে তার ১৭ দিন পর গত ২৬ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার)।

চতুর্থ কারণ হলো আওয়ামী লীগ শাসনের গত তিন বছরে চাল-আটা, তেল-ডাল, মাছ-মাংস, দুধ-ডিমের মতো প্রয়োজনীয় খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সব পণ্যের দাম বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সরকার এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। একই সময়ে ভুল নীতির কারণে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বেড়েছে দফায় দফায়। কারসাজির ফলে শেয়ার মার্কেট ধসে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা হয়েছেন নিঃস্ব। উন্নয়নখাতে ছিল না গতি। ফলে বেকার ও দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদের লোভ, অনিয়ম, নির্লজ্জ টেন্ডারবাজির ফলে দুর্নীতি ছড়িয়ে গেছে দেশের সব ক্ষেত্রে ও প্রান্তে। আইনশৃঙ্খলা অবনতির ফলে নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে গেছে। জাতীয় সংসদ বাস্ড়বত দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করে না বলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা সেখানে ওঠে না। এসব মিলিয়ে জনগণ প্রচন্ড হতাশায় ভুগছেন এবং ক্ষোভে ফুঁসছেন। সাম্প্রতিক স্থানীয় নির্বাচন এবং বেসরকারি জরিপে শাসক দলের প্রতি জনগণের বীতশ্রদ্ধ মনোভাব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। ফলে বিভিন্ন মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের নেতারা ক্রমাগত উল্টাপাল্টা কথা বলছেন। বোঝাই যায় যে, তাঁরা এখন জনগণকে ভয় পাচ্ছেন। যার দরুন বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের ওপর সরকার চালাচ্ছে নিপীড়ন।

শুরুতেই বলেছি, বাংলাদেশ তার শাসকদের কাছে পরাজিত হলো গতকাল। দেশটির ও এ দেশের সমাজের এই পরাজয় হয়েছে সরকারপক্ষ সভ্যতা ও গণতন্ত্রকে অসম্মান করার ফলে। বিএনপির পূর্ব-ঘোষিত নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচি গণমিছিলের দিন আওয়ামী লীগ ঢাকায় তাদের জনসভা না ডাকলেও পারত। ওই জনসভা ডেকে তারা প্রমাণ করেছে যে, তারা ওই মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করানোর অজুহাত সৃষ্টির জন্যই সভা ডেকেছে। এটা নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নীতি ও আচরণের পরিপন্থী। শুধু তা-ই নয়, এর মাধ্যমে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা হলো, চলমান রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির ধারাকে আরও প্রবল করা হলো এবং দুঃশাসন কায়েম রাখা হলো।

এখানে উলেখ করা প্রয়োজন যে, দেশে তো সাধারণ মানুষ, বিরোধী দলগুলোর নেতাকর্মীরা (যাতে সর্বশেষ সংযোজন বু ব্যান্ড কল) এবং বিরোধী মতাবলম্বীরা তো সরকারি নিপীড়ন, পুলিশি নির্যাতন ও ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারদের হামলার ভয়ে থাকছেন সারাক্ষণ। বিদেশেও বাংলাদেশের সম্পর্কে ধারণা জন্মাচ্ছে যে, বাংলাদেশে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমাগত বিলুপ্ত হচ্ছে। যে দেশ স্বাধীন করার জন্য লাখ লাখ লোক হানাদার পাকিস্ড়ানিদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে এবং তারপরও স্বৈরশাসকদের হটিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করেছে, তার এই পরিণতি দুঃখজনক। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই বলা যায় যে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে অসহিষ্ণুতা এবং বিরোধী দল ও মতকে অত্যাচার করে দমিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। যেমন ২০০৪ সালের ৩০ এপ্রিল আওয়ামী লীগ ঢাকায় যে সরকারবিরোধী গণসমাবেশ আহ্বান করেছিল, আওয়ামী লীগের তত্কালীন সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল যার নাম দিয়েছিলেন 'ট্রাম্প কার্ড', তা বানচাল করার জন্য জোট সরকার ঢাকার লঞ্চঘাট, বাসস্টেশন ও রাজপথ থেকে বিরোধীদলীয় কর্মীদের এবং হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করেছিল। সেই গণগ্রেফতারের ঘটনা আসলেই ছিল দেশের জন্য লজ্জাকর।

সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী নিপীড়নও হয়েছিল, যার উদাহরণ আওয়ামী লীগ নেতা সাবের হোসেন চৌধুরী, ইতিহাসবিদ ও প্রাবন্ধিক মুনতাসির মামুন, সাংবাদিক এনামুল হক ও সেলিম সামাদকে গ্রেফতার এবং জেলে হয়রানি। 'ক্লিন হার্ট' অপারেশনের কথাও ভোলার নয়। জোট সরকারের পর জরুরি আইনের শাসনের নামে দুই বছর ধরে যে সেনা-শাসন চলেছিল, তখন দেশের শীর্ষ নেতা বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা এবং আরও বহু নেতাকর্মী, সংবাদপত্র সম্পাদক ও প্রশাসক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা কারাভোগ করেছেন ও নির্যাতিত হয়েছেন। আর সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার তো স্থগিতই করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষের প্রশ্ন হলো, ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ জোরগলায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা দেশে গণতান্ত্রিক নীতি, রীতি ও মূল্যবোধের চর্চা প্রতিষ্ঠা করবে, রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করবে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। আরও অনেক কিছু বদলে দেয়ার মতো রাজনৈতিক অঙ্গন ও জনগণের মানবিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রেও তারা আনবে ইতিবাচক পরিবর্তন। কিন্তু কোথায় সেই দিনবদল। পরিবর্তন যা হচ্ছে সবই তো খারাপের দিকে। এখন বুঝি প্রতিবাদ করার সুযোগটুকুও যায়।

শুরুতে যে সভ্য আচরণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলাম তার একটা বিশেষ কারণ আছে। সেটা হলো, ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও আরও কিছু দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও জনজীবন স্থবির করে দেয়া 'অবরোধের' মুখে সে বছর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে বিরোধী দলবিহীন নির্বাচনে গঠিত জাতীয় সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক ব্যবস্থা করে তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ওই সংসদ ভেঙে দেন এবং নিজেও পদত্যাগ করেন। ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার দাবি ছিল আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী দলগুলোর। কিন্তু পদত্যাগ করার ও তার পরদিন বেগম জিয়ার ডাকে ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পরপর দুটি বিশাল গণজমায়েত হয়। ওই জমায়েতের অদূরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে চলছিল আওয়ামী লীগ ও মিত্রদের জনতার মঞ্চ। সেখানেও ছিল বড় সমাবেশ। কিন্তু ওই দুই দিনের একদিনও দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয়নি। সদিচ্ছা ও সহিষ্ণুতা থাকলে যে বড় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল একই দিনে একই শহরে তাদের আলাদা সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারে সেদিন আমরা তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ দেখেছি। কাজেই রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা, সংযম, শিষ্টাচার ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়া যে আন্তরিকতার ওপর নিভুর্র করে, তা প্রমাণিত। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো কেন সেই আন্তরিকতা দেখাবে না?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের এই প্রসঙ্গে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভেবে দেখতে বলি। তাঁরা জাতীয় নির্বাচনের সময় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখার ব্যবস্থা তুলে দিয়েছেন। বিএনপি সেই ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে বলছে। তবুও ক্ষমতাসীনরা বলছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনেই হবে। কিন্তু রোববার ঢাকায় বিএনপির গণমিছিল নিষিদ্ধ করার পর বিরোধী দল তো সঙ্গতকারণেই বলতে পারবে এখনই আওয়ামী লীগ সরকার তাদের ওপর জুলমের স্টিমরোলার চালাচ্ছে, কণ্ঠরোধ করছে ও সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করছে; তাহলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তারা তো বিরোধীদের ঘর থেকেই বের হতে দেবে না। আওয়ামী লীগ সরকারের বর্তমান আচরণই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি দাঁড় করিয়েছে।

আমি এই লেখাটা লিখেছি গতকাল সকালে। গত বিকাল নাগাদ জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপির সদস্য ও সমর্থকদের বিক্ষোভে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন সংগঠনের ক্যাডারদের সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন ও তিন-চারশত লোক আহত হয়েছেন। আমার এই লেখাটিতে এসব দুঃখজনক ও নিন্দনীয় ঘটনা বিবেচনায় নিতে পারিনি। এ বিষয়গুলোয় অধিকতর তথ্য জেনে আগামীতে লিখতে পারব বলে আশা করি। তবে আরও ১০ জনের মতো আমাকেও বিশ্বাস করতে হচ্ছে যে, দেশ বড় দুর্যোগের দিকে দ্রুত ধাবমান।